বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তার কথার দাম আছে। কিন্তুবামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েছে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভারএকজন ভালগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না!

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়েফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমারক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হ'ল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না করো বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ি চলে যাও!"

বাড়ি এসে যখন সে বসল, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনেরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, সেখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়িতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনিপশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন— টেলিগ্রাফি শিখতে। তা হলে রেলে চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটাটেলিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন আর টেলিগ্রাম শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্বদা গম্ভীর-চালে থাকত, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ির সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীরমুখে বললে, "এই, সব নাম—গাছ থেকে নাম!"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সেখোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয় তারচেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরনের কথাবার্তায় বেশ কাজ হল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থাঅল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়, অতএববামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগল—তারা মাথা নিচু করে যে যারবাড়ি চলে গেল।

এই সময়েই ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে টেলিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীরমুখে ওদের বাড়ির পশ্চিমের ঘরে বসে ঢেঁকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টিনেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই—শনিবার-রবিবার নেই। কি সে অধ্যবসায়। দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগ দেখাননি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখি বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে!বছরখানেক টেলিগ্রাফি শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে, কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো, "জানিস, ই-আর-আর রেলের টি-আই সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে! তার নিজের হাতের সই আছে!"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করতো, "কি লিখেছে বামাচরণ-দা?"

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া..."

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দু'বার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো, "এই দ্যাখ্!"

কিন্তু এত করেও কিছু হল না, মাসের পর মাস গেল, টি-আই সাহেবের সে চিঠি আরপৌঁছুল না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা-আকাশে একদিন চাঁদ উঠল। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালেরফৌজদারি কাছারির নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময়ে বম্‌পাশ সাহেব মেহেরপুরেরজয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমশায়কে খুবই খাতির করতো, ভালও বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেনশনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেতবৃদ্ধমণ্ডলীর কাছে চাকরি-জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তোআমিই কাজ শিখিয়েছি, ছোকরা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—ট্রেজারিঅফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেতো। আমায় বলতো, শোনো নাজির, এ আমার পোষাবে না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুল!কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম!"

সে গ্রামে গবর্নমেন্টের চাকরি বামাচরণের বাবা ছাড়া কেউ করেনি—সবাই হাঁ করেথাকত; পেনশনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী'কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরিপহচ্চে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে, তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখাকরার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন : "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এন্ট্রান্স পাশকরতো তবে আমি ওকে সাবডেপুটি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মাবললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গেনিয়ে বাড়ি এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোণা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে এনেরান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোনো ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভাল জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেননি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশিদিন বাঁচেননি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণেরও বয়স হয়ে উঠল। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু'একটি ছেলেপুলেও হল।

গ্রামের যেসব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীরমুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভাল লেখা-পড়া শিখেচে, দু'একজন ভাল চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেনশনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলে-মেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়িতে, তারও দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধা মা,—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর?

* * * *

এই সব কথাই সে ভাবছিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চটকা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজানমুখে চলেচে,—বোধ হয় জোয়ার এল।

সামনের চট্‌কাগাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসছে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে, জায়গাটাচারিদিকে নির্জন।

এখন তার মনে হয়, খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে। হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়ল—ওটা কি?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত-ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখানথেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড়কলসি পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েছে—অর্ধেকটা দেখা যাচ্চে, বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যেপোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে, এই বাঁকেরমুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল, অনেক লোকের বাস ছিল। কলসিটা জমির ওপর থেকে হাত-চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্থায় রয়েছে। সেকালে লোকেকলসি করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসি!

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জন, অন্য লোকে এদিকে আসে না, কলসিটা আর কেউ দেখেনি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কালরাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কানাভাঙা কলসি! কে-ই বাতার পরএসেচে এদিকে!

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদুরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্যন্ত তাদের দৌড়, এতদূরে কেউ কোমর-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল। তাকেএখানে কেউ না দেখে ফেলে।

বাড়িতে এসে সে ভাবতে বসল। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসিটাতুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব, যদিশাবলের ঘায়ে কলসিটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হলে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে!

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসি পর্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসি বার করতে হবে। তাতে অন্তত দু'জন লোকের দরকার—মই নিচে থেকে একজন ধরেথাকা চাই, কলসি নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেবার ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলাধুলায় খুব পটু আর সাহসীও বটে।বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়!"

পিতাপুত্রে মই, শাবল, একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাতদুপুরের পরে নদীর ধারে চট্‌কাগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেছে তার বাবা তাকে বলেনি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ইজেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরিকরতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে, কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমর-জাল ফেলে না, এ তো চট্‌কাতলার বাঁক..."

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা..."অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠল। নিতাই খুব অবাক হয়ে গিয়েচে পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে, কি আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে এমন নয়। বড় মাছ নয়, তাহলে হয়তো বাবা কোনো ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতেএসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায়ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুববেশি দূরে নয়—নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠল।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁজতে লাগল। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছুদেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজচে। একবার সে বললে, "কি বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর না! মই ধরে থাক, তোর সে কথায় দরকারকি?"

নিতাই চুপ করে রইল, কিন্তু ওষুধ খুঁজতেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নিচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পাচ্ছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসি নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামল।নিতাই অবাক হয়ে বললে, "কি বাবা এতে?"

"চুপ কর না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কি দরকার? শাবল আর মইটা নিতেপারবি একলা?"

কেউ না দেখে, এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চলল। বেশি রাত্রে চৌকিদারপাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকিদারের সামনেই পড়ে যায়!

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে। কলসিটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো ভারীজিনিসে ভর্তি। কলসির মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটিরমধ্যে থাকার দরুন সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েছে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ি পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলোনিয়ে এসো তো?"

ওর আর বিলম্ব সইছে না, এখুনি সে কলসির মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্কসের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে।বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসিটাতে কি? মড়ার কলসির মতো দেখতে, ওটাকে আনলে কোথাথেকে গো?"

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসিটা ফাটিয়েফেললে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

নিতাইয়ের মা অবাক, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসি কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে দেখোতো?"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এত কষ্ট তবে সব বৃথা! রুপোর গুঁড়োওএতটুকুনেই কলসিটাতে! কোথায় এক কলসি টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কিকালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে!

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভাল নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসি পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হলে বম্‌পাশ সাহেবেরদেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে—পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট!

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতেপারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি, বহুকালের পুরনো ঘি—কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রি করবে—কলকাতায় বউবাজারেরসেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এল।

বউবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গেতাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, "হ্যাঁ জিনিসটা খুবই ভাল, অন্তত দুশো বছরেরপুরোনো। তোমাদের ঘরে ছিল?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসি-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চলল, ওরা সাত টাকার বেশি দর দিতে রাজী নয়—তারপর উঠল দশ টাকায়, তার বেশি কিছুতেই নয়। বুড়োকবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু'টাকা সেরেই জিনিসটা দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন, তিনি উঠেএসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার।আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে, হাঁপকাশেরঅসুখ, এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতার কোনো দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেব। একশো টাকা করে সেরেরদাম দেব আমি, ওজন করুন মাল।"

এ কলসিতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসিটাতে বোধ হয় আরোবেশি ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসিতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলেনি—এখন তো বামাচরণের অনন্তকালপড়ে রয়েছে, রাজা হওয়া আশ্চর্যটা কি!